MAQAM : Center For Sufi Heritage

৭/১৫, আজিজ মহল্লা, ব্লক এফ, জয়েন্ট কোয়ার্টার, মোহাম্মদপুর, ঢাকা - ১২০৭

বাংলার সুফিদের সংগ্রামী ঐতিহ্য: জুলাই অভ্যুত্থানের রুহানিয়্যত

মুহাম্মদ আবদুল ক্বাহহার

কী-ওয়ার্ড
সুফি, জুলুম, মজলুম, যুদ্ধ, সংগ্রাম, রুহানিয়্যত, ইনসাফ, বিবেক

(যারা ইসলাম প্রচার-প্রসারে যুক্ত ছিলেন, সুফি হিসেবে পরিচিত, যাদের মাজারে সুফি সংস্কৃতির চর্চা রয়েছে তাদের মধ্য থেকে যারা প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধ, লড়াই-সংগ্রাম করেছেন তাদের সংগ্রামকেই আমরা 'সুফিদের সংগ্রামী ঐতিহ্য' হিসেবে চিহ্নিত করেছি। প্রবন্ধে কেবল তাঁদের সুনির্দিষ্ট সংগ্রামকেই সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে, যেন আমাদের ফোকাস পয়েন্ট ঠিক থাকে। উল্লেখের বাহিরেও বিশাল সংখ্যক সুফি রয়েছেন যারা সংগ্রামী জীবন যাপন করেছেন। এখানে কেবল প্রতীক হিসেবে দশজনের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। যেহেতু প্রায় সকল সুফির জন্ম-মৃত্যুর ব্যাপারে একাধিক মত আছে, বিতর্ক আছে সেহেতু কোনো সন উল্লেখ না করে কেবল শতক উল্লেখ করা হয়েছে।)

যা ব্যাখ্যা করা হয়েছে: বাংলায় বসবাস করে যেসব সুফিগণ ইন্তেকাল করেছেন এবং যাদের মাজার বাংলায় রয়েছে, তাঁদের সংগ্রামী জীবনকে উল্লেখ করে তাঁদের সংগ্রামী ঐতিহ্যের সঙ্গে জুলাই অভ্যুত্থানকে রুহানিয়্যতের মাধ্যমে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে।

পারিভাষিক ব্যাখ্যা:
বাংলার সুফি: যারা বৃহত্তর বাংলায় (মুঘল আমলের মানচিত্র বিবেচনায়) বসবাস করেছেন, ইন্তেকাল করেছেন, তাঁদের মাজার আছে এবং তাঁদের মাজারে সুফি সংস্কৃতির চর্চা রয়েছে।
রুহানিয়্যত: পরিভাষাটি রাজনৈতিক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।
জুলাই অভ্যুত্থান: ২০২৪ সালে সংঘটিত আওয়ামী লীগ সরকারের (স্বৈরাচারের) বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান।
জুলুম: বৃহত্তর অর্থে আধিপত্যবাদ, অন্যের অধিকারকে খর্ব করা, ইনসাফের বিরুদ্ধে অবস্থান করা।

ভূমিকা: বাংলায় ইসলাম প্রচার-প্রসারে সুফিদের নেতৃত্ব অনস্বীকার্য। সুফিদের খানকা, দরগা কেন্দ্র করেই বাংলার মুসলিম সমাজ গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশে এমন কোন শহর, জেলা বা উপজেলা নেই যেখানে কোনো সুফীর মাজার নেই। আরব সাম্রাজ্যবাদের পৃষ্ঠপোষকতায় আসা সালাফিবাদ, খারিজিয়্যতের আধিপত্য থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ থেকে সুফিদের প্রভাব দূরীভূত করা যায়নি এবং কখনো যাবেও না। জুলাই অভ্যুত্থানে, অংশগ্রহণকারীদের ধর্মীয় পরিচয় ও আদর্শ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণের পেছনে জুলুমের বিরুদ্ধে ইসলামের যে অবস্থান তা গভীরভাবে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। জুলুমের বিরুদ্ধে ইসলামের এই অবস্থান এবং তার প্রভাবে জালেমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা মুসলমানদের জন্য নতুন কোনো ঘটনা নয়, বরং প্রি-কলোনিয়াল আমলে বাংলার জনপ্রিয় সুফীগণ জালেমের বিরুদ্ধে ইনসাফের জন্য সংগ্রাম করেছেন। ব্রিটিশ আমলেও, আজাদির জন্য একাধিক সুফি নেতৃত্বের ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেছেন। বাংলায় ইসলাম প্রচার-প্রসারে নেতৃত্বের ভূমিকায় থাকা সুফিদের সংগ্রামী ঐতিহ্যের সাথে জুলাই অভ্যুত্থানকে সংযুক্ত করা ইতিহাস ঐতিহ্যের প্রশ্নে গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলায় সুফিদের সংগ্রামী ঐতিহ্য

বাংলায় সুফিদের আগমন শুরু হয়েছে দশম শতাব্দীতে। সে সময়ে বাংলার স্থানীয় সমাজ ও শাসনব্যবস্থা এবং ধর্ম হিসেবে ইসলামের সমাজ ও শাসনব্যবস্থার রূপরেখা ছিল প্রায় সাংঘর্ষিক। ফলে, তৎকালীন বাংলার সমাজ ও শাসনব্যবস্থায় ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে স্থানীয় সমাজ ও শাসনব্যবস্থার নেতৃত্বে থাকা হিন্দু রাজা, জমিদারদের বাধাবিপত্তি ছিল অনিবার্য। সেই বাধাবিপত্তিকে মোকাবেলা করা মানেই ছিল সংঘাত, সংঘর্ষ অর্থাৎ সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া। ফলে, তৎকালীন বাংলায় ইসলাম প্রচার কোনো নিরীহ 'অরাজনৈতিক' ঘটনা ছিল না। স্থানীয় জনগণ, যারা হিন্দু ধর্মের সমাজব্যবস্থার বর্ণপ্রথা ও ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতির যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হচ্ছিলো তাদের কাছে যখন সুফিরা ইসলামের দাওয়াত নিয়ে আসে তখন তা শুধু হিন্দু ধর্মের মতোই আরেকটা ধর্ম হিসেবে আসেনি, বরং মুক্তির পথ হিসেবে এসেছিলো। জনগণ যখন বর্ণপ্রথার অত্যাচারে অতিষ্ঠ তখন সুফিরা বললেন, ইসলাম ধর্মে আল্লাহর কাছে সকলেই সমান, ইসলামী সমাজব্যবস্থায় উঁচু নিচু ভেদাভেদ নেই। সুফিরা ইসলামকে ধর্ম হিসেবে প্রেজেন্ট করলেও নিষ্পেষিত জনগণের নিকট তা মুক্তির পথ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। রিচার্ড এম. ইটন যেমনটি বলেছেন: "শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, নিপীড়ক ও অত্যাচারী উচ্চবর্ণের হিন্দুদের, বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়েছে নিম্নবর্ণের হিন্দু সমাজ। এমতাবস্থায় যখন ইসলাম ভারতীয় উপমহাদেশে আগমন করে, সুফি শেখদের প্রচারিত সামাজিক সাম্যের মুক্তির বার্তা নিয়ে, তখন এই নিপীড়িত জাতিগুলি, ব্রাহ্মণ্য নিপীড়নের যাঁতাকল থেকে মুক্তি পেতে এবং এতদিন তাদের থেকে দূরে রাখা সামাজিক ন্যায়বিচার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।"[১]

ইটন এই তত্ত্ব উল্লেখ করে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন, কিন্তু খারিজ করার যুক্তি দাঁড় করাতে পারেননি। কারণ, এই তত্ত্ব খারিজ করলে বাংলায় ইসলাম প্রচার-প্রসারের যে ব্যাপক সাফল্য তার হিসাব মেলানো মুশকিল হয়ে যায়। পাশাপাশি, সুফিদের যত যুদ্ধের কথা আমরা জানি, ইতিহাস ও কিংবদন্তির সূত্রে, কোথাও সুফিদের বিরুদ্ধে জনগণের কোনো অংশের বিদ্রোহের কথা পাওয়া যায় না। এ থেকেও যৌক্তিক ধারণায় উপনীত হওয়া যায় যে, হিন্দু ধর্মের সমাজব্যবস্থার বর্ণপ্রথা ও ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতির যাঁতাকলে পিষ্ট জনগণের নিকট সুফিরা ইসলামের প্রতিনিধি হিসেবে সামাজিক মুক্তির সম্ভাবনা নিয়ে হাজির হয়েছিলেন এবং অনিবার্যভাবে, নিপীড়িত জনগণ তাদেরকে নানাভাবে সহযোগিতা করেছিলো। আকবর আলি খান এ তত্ত্বের সত্যতা যাচাইয়ে একাধিক যুক্তি উপস্থাপনের মাধ্যমে অযৌক্তিক প্রমাণের চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সুফিদের বিপ্লব, সংগ্রামের পর কেন জনগণের কোনো অংশের বিদ্রোহের কথা পাওয়া যায় না তা উল্লেখ করেননি।[২] বরং, যুদ্ধের পর সুফিদের কাছে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকজনের আনাগোনার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইবনে বতুতা প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে সাক্ষ্য দিয়েছেন, সিলেট বিজয়ের পর হজরত শাহজালালের দরবারে হিন্দু ও মুসলমান সমাজের জনগণের স্বাভাবিক যাতায়াত ছিল। এখানে স্পষ্ট যে, একজন হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করেও একজন ইসলাম প্রচারকের দরবারে গিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করছে। অর্থাৎ ধরে নেয়া অযৌক্তিক হবে না যে, ইসলাম গ্রহণ না করেও ইসলাম প্রচারককে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হিন্দু, এতদিন যাবৎ যে জালেম শাসকের জুলুমের শিকার ছিল এবং ইসলাম প্রচারকের নেতৃত্বে এই জালেমের পতন হয়েছে বিধায় সেই ইসলাম প্রচারক ভিন্নধর্মী হলেও তার কাছে ত্রাণকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে নিপীড়িত জনগণের পক্ষে বর্ণপ্রথা ও ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতির চর্চাকারী স্থানীয় শাসকদের মোকাবেলা করার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সুফিসমাজ অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা না করে পিছু হটেছেন এমন কোনো সুফির নাম আমরা ইতিহাসে দেখি না। অর্থাৎ ইসলাম প্রচার করতে এসে যিনিই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছেন তিনিই সাহসিকতার সাথে মোকাবেলা করেছেন, সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছেন। সংগ্রামে প্রাপ্ত সফলতার মাধ্যমেই বাংলায় ইসলাম প্রচারের নেতৃত্বের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলো সুফিসমাজ। এ বিষয়ে কোনো বিতর্ক নেই যে, বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে একক নেতৃত্ব দিয়েছে সুফিসমাজ। এই নেতৃত্ব অন্তত আঠারো শতক পর্যন্ত বলবৎ ছিল। মাঝখানে প্রায় হাজার বছর– কখনোই এই নেতৃত্বে হেরফের হয়নি। হাজার বছর কিভাবে সুফিসমাজ ইসলাম প্রচার-প্রসারের নেতৃত্ব একাধারে বজায় রেখেছেন তা নিয়ে রয়েছে নানাবিধ তত্ত্ব, বিতর্ক ও মতামত। প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায় সুফিদের রাজনৈতিক সচেতনতা ও সংগ্রামকে। প্রায় কোনো সুফিই সরাসরি রাষ্ট্র,

---

১. *The Rise of Islam and Bengal Frontier*, 1204-1760: Richard M. Eaton, University of California Press, London, 1993, 73-80

২. *বাংলাদেশের সত্তার অন্বেষা*: আকবর আলি খান, আমিনুল ইসলাম ভুইয়া অনুদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৪, ৮৮-৯৪

রাজ্য পরিচালনায় যুক্ত ছিলেন না (খানজাহান আলী বিরল ব্যতিক্রম), তথাপি রাজনীতি ও রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। কালানুক্রমিক দুই পর্বে এমন দশজন সুফিকে আমরা শনাক্ত করছি।

প্রথম পর্ব (প্রাক-ব্রিটিশ)

শাহ সুলতান বলখী (দশম শতক) : পারস্যের রাজবংশ থেকে আগত শাহ সুলতান বলখী যুদ্ধ করেছেন রাজা পরশুরামের সঙ্গে। মহাস্থানগড় ছিল বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির পাদপীঠ। রাজা পরশুরাম বৌদ্ধদের উপর জুলুম করে তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলো। এমতাবস্থায় শাহ সুলতান বলখী মহাস্থানে আগমন করে পরশুরামের জুলুমকে চ্যালেঞ্জ করেন। পরশুরামের বিশাল সেনাবাহিনী থাকলেও শাহ সুলতানের নিকট তার শোচনীয় পরাজয় ঘটে।[৩] বৌদ্ধ অধ্যুষিত বগুড়ায় ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে শাহ সুলতানের এই সংগ্রাম সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছে। ডক্টর আবদুর রহিম এইচ বেভারেজ'র সূত্র ধরে বলেছেন, রাজা পরশুরামের জুলুমের বিরুদ্ধে শাহ সুলতান বলখী স্থানীয় জনগণের একটি বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরাও এই বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিলো।[৪]

বাবা আদম শহীদ (বারো শতক) : বাংলায় প্রাথমিক পর্যায়ে আসা সুফিদের মধ্যে বাবা আদম শহীদ অন্যতম একজন। দ্বাদশ শতাব্দীতে তিনি ঢাকার বিক্রমপুর এলাকায় ইসলাম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তৎকালীন বিক্রমপুরের শাসক রাজা বল্লাল সেন মুসলমানের গরু জবাইয়ের অধিকার স্বীকার করতে রাজি হননি। ফলত, তিনি মুসলমান জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। বাবা আদম স্বল্প সৈন্য নিয়েই যুদ্ধের ময়দানে যান এবং বল্লাল সেনের সৈন্যদের হাতে শহীদ হন। যুদ্ধের ময়দানে তাঁর শাহাদাতের ফলে বিক্রমপুরে ইসলাম প্রচারের পথ সুগম হয়। যার নজির হিসেবে বিবেচিত তাঁর মাজার সংলগ্ন মসজিদ, যা ১৪৮৩ খ্রিস্টাব্দে সুলতান জালালুদ্দিন ফতেহ শাহ'র তত্ত্বাবধানে নির্মিত হয়।[৫]

শাহ মাখদুম (বারো শতক) : বরেন্দ্র অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে প্রধান হজরত শাহ মাখদুম রূপোশ, রাজশাহীর প্রাণকেন্দ্রে যার মাজার অবস্থিত। তিনি সুদূর বাগদাদ থেকে বাংলায় আসেন ইসলাম প্রচারের জন্য। রাজশাহীতে তখন নরবলি প্রথা চালু ছিল। এই নরবলির বিরুদ্ধে প্রথমে শাহ তুরকান দেওরাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন এবং দেওরাজ রাতের অন্ধকারে শাহ তুরকানকে নির্মমভাবে হত্যা করে।[৬] শাহ তুরকানের শাহাদাতের খবর পেয়ে শাহ মাখদুম তাঁর অনুসারীদের সঙ্গে নিয়ে রাজশাহীতে আসেন এবং দেওরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন। যুদ্ধে দেওরাজের শোচনীয় পরাজিত ঘটে। শাহ মাখদুমের এই বিজয়ের মাধ্যমে রাজশাহী থেকে চিরতরে নরবলি প্রথা বিলুপ্ত হয়।[৭] রাজশাহীর জনগণকে দেওরাজের জুলুম থেকে মুক্ত করে ইসলামের মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য শাহ মাখদুম যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

শাহ মাখদুম গজনবী (চৌদ্দ শতক) : পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটে অবস্থিত শাহ মাখদুম গজনবীর দরগাহ। তিনি যখন ইসলাম প্রচারের জন্য মঙ্গলকোটে যান তখন সেখানকার শাসনব্যবস্থার নেতৃত্বে ছিলেন রাজা বিক্রম কেশরি। রাজা ইসলাম প্রচারে বাঁধা দিলে শাহ মাখদুম দিল্লির সুলতানের নিকট অভিযোগ করেন এবং দিল্লি থেকে যখন সেনাবাহিনী আসলো তখন তিনি রাজা বিক্রমের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। রাজা বিক্রম যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মঙ্গলকোট ত্যাগ করলে সেখানে মুসলিম নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয় এবং শাহ মাখদুম গজনবী ইসলাম প্রচারে নেতৃত্ব দেন।[৮]

শাহজালাল ইয়ামেনী (চৌদ্দ শতক) : বাংলার সুফিদের সর্বাধিক সংগ্রামী ইভেন্টের নেতৃত্বে ছিলেন হজরত শাহজালাল। রাজা গৌড়গোবিন্দ মুসলমানের গরু জবাইয়ের অধিকার স্বীকার না করে একে অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করে এবং বোরহানউদ্দিনের শিশু

---

৩. *বাংলাদেশে ইসলাম*: আবদুল মান্নান তালিব, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৯৪, ৭৯-৮০

৪. *Social and Cultural History of Bengal* (Vol. 1): Muhammad Abdur Rahim, Dhaka, 1959, 82

৫. তালিব, প্রাগুক্ত, ৮৫-৭

৬. হযরত শাহ্ মখদুম রূপোশ (রহ.) এর জীবনেতিহাস: মুহম্মদ আবু তালিব সম্পাদিত, পাকিস্তান বুক করপোরেশন, ঢাকা, ১৯৬৯, ৫৩-৮

৭. *রাজশাহীতে ইসলাম*: ডঃ এ কে এম ইয়াকুব আলী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৯২, ৩৭

৮. *মুহম্মদ এনামুল হক রচনাবলী* (চতুর্থ খণ্ড): মনসুর মুসা সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৫, ১৮৩-৮৮ (*A History of Sufi-Ism in Bengal*)

পুত্রকে হত্যা করে। রাজার এই জুলুমকে প্রতিহত করতে ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ'র সৈন্যবাহিনী ও শাহজালালের দলের ৩৬০ জন আউলিয়া মিলে গৌড়গোবিন্দকে যুদ্ধের ময়দানে পরাস্ত করার মাধ্যমেই শহর থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইসলাম প্রচার ব্যাপকতা লাভ করে।[৯] প্রবল প্রতাপশালী গৌড়গোবিন্দের বিরুদ্ধে হজরত শাহজালালের সেই ঐতিহাসিক সাহসী ভূমিকা আজও বাংলার মুসলমানদের জালেমের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অনুপ্রেরণা যোগায়। ইবনে বতুতা সাক্ষী, এই বিজয়ের পর সিলেটের জনগণের কোনো অংশ বিদ্রোহ করেননি, বরং জনগণের হিন্দু অংশ, যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেননি, তাঁরাও শাহজালালের দরবারে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।[১০] এ থেকে অনুমান করা ভুল হবে না যে, হিন্দুরাও সমানভাবে গৌড়গোবিন্দের জুলুমে নিষ্পেষিত হয়েছিলেন এবং তাদের জন্য হজরত শাহজালাল মুক্তিদাতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

নূর কুতুবুল আলম (পনেরো শতক) : সুলতানী আমলের মধ্যভাগে ইলিয়াস শাহী বংশ থেকে রাজা গণেশ ক্ষমতা দখল করে। ক্ষমতা দখলের পর বিশেষত মুসলমানদের উপর, ফকির-দরবেশদের উপর উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে জুলুম শুরু করে। একদল দরবেশকে রাজ দরবারে ডেকে জোর করে নৌকায় উঠিয়ে নদীতে ডুবিয়ে হত্যা করে। এই জুলুমের বিরুদ্ধে হজরত নূর কুতুবুল আলম জৈনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কিকে বাংলা আক্রমণের অনুরোধ করেন। সুলতান বাংলায় আসলে রাজা গণেশ কুতুবুল আলমের নিকট আত্মসমর্পণ করেন।[১১] ওয়াদা ভঙ্গ করে পরবর্তীতে গণেশ বেইমানি করলেও কুতুবুল আলমের এই ভূমিকার জন্যই সুলতানী আমল যথারীতি ট্র্যাকে ফিরতে পেরেছিলো এবং বাংলা মুসলমানদের আয়ত্তে এসেছিলো। ডক্টর এনামুল হকের মতে, নূর কুতুবুল আলমের এই ভূমিকা হজরত শাহজালালের সিলেট বিজয়ের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ।[১২]

দ্বিতীয় পর্ব (ব্রিটিশ)

নূর মোহাম্মদ নিযামপুরী (উনিশ শতক) : নোয়াখালীতে জন্মগ্রহণ করা সুফি নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী সৈয়দ আহমদ শহীদের নেতৃত্বে একাধিক যুদ্ধের সেনাপতি ছিলেন। বালাকোটের যুদ্ধে তিনি ছিলেন সৈয়দ আহমদের অন্যতম সংগঠক। বালাকোট থেকে আহত অবস্থায় ফিরে তিনি মীরসরাইয়ের নিজামপুরে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। পরবর্তী জীবনে তিনি তরীকা-ই মোহাম্মদীয়ার প্রচার প্রসারে মগ্ন ছিলেন।[১৩]

আবু বকর সিদ্দিক (বিশ শতক) : ফুরফুরার পীর আবু বকর সিদ্দিক ব্রিটিশ আমলে খেলাফত-অসহযোগ আন্দোলন থেকে শুরু করে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। তৎকালীন বাংলার যত আলেম-ওলামা রাজনৈতিকভাবে সচেতন ছিলেন প্রায় সকলের মান্যবর ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনি। কেবল ব্যক্তিগত জায়গা থেকে নয়, সাংগঠনিকভাবেও তিনি সংগ্রাম করেছেন। বাংলার আলেম সমাজকে সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে সচেতন করতে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'জমিয়ত-এ-উলামা-এ-বাংলা'।[১৪]

বাদশা মিয়া (বিশ শতক) : পীর বাদশা মিয়া ছিলেন ফরায়েজী আন্দোলনের ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব হাজী শরীয়তুল্লাহ'র নাতি। তিনি ঢাকায় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার সাথে জড়ত ছিলেন। খেলাফত-অসহযোগ আন্দোলনে তিনি এতটাই সক্রিয় ছিলেন যে ইংরেজ সরকার তাকে হুমকি হিসেবে বিবেচনা করে এক বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। জেল থেকে বের হয়ে তিনি আবারো সংগ্রামী জীবনে ফিরে যান এবং পাকিস্তান আন্দোলনেও যথারীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৩৭ সালে বাংলার প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে কৃষক-প্রজা পার্টির বিজয়ের পেছনে তাঁর অবদান ছিল শীর্ষ পর্যায়ের। পাকিস্তান হাসিলের পর 'জমিয়ত-এ-উলামা-এ-ইসলাম' এবং 'নেজামে

---

৯. প্রাগুক্ত, ২১৮-২৪

১০. The Rehla of Ibn Battuta: Mahdi Husain, Oriental Institute, Baroda, 1976, 239

১১. *বাংলার ইতিহাস (রিয়াজ-উস সালাতীনের বঙ্গানুবাদ)* : আকবরউদ্দীন অনুদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৪, ৮৮

১২. *মুহম্মদ এনামুল হক রচনাবলী* (প্রথম খণ্ড) : মনসুর মুসা সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯১, ১০৯-১১০ (*বঙ্গে স্বূফী-প্রভাব*)

১৩. *চট্টগ্রামের সুফি সাধক ও দরগাহ*: ড. মুহম্মদ শেহাবুল হুদা, শাহাব উদ্দিন নীপু অনুদিত, অন্বেষা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৯, ১৩১-৪৯

১৪. *রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা*: ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০০৯, ২৩১-৪

ইসলাম পার্টি'র পৃষ্ঠপোষকতা করেন।[১৫] বলা যায়, পূর্বপুরুষ থেকে পাওয়া সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতার ঐতিহ্য সঙ্গে নিয়েই তিনি আমৃত্যু জীবন যাপন করেছেন।

মাওলানা ভাসানী (বিশ শতক) : শত বছরের মধ্যে পূর্ববঙ্গের সুফি রাজনৈতিক ব্যক্তি হিসেবে মাওলানা ভাসানীর অবদান ও স্বীকৃতি সর্বাধিক। কিশোরকালে তিনি সুফি নাসিরউদ্দিন বোগদাদির সান্নিধ্যে আসেন এবং তাঁর নির্দেশেই ঐতিহ্যবাহী দেওবন্দ মাদ্রাসায় পড়তে যান। দেওবন্দ থেকে ফিরেও তিনি পীর নাসিরউদ্দিনের আশ্রয় গ্রহণ করেন। পীরের তত্ত্বাবধানেই তিনি সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতা লাভ করেন।[১৬] পরবর্তী জীবনে আসামের বাঙ্গাল খেদা আন্দোলন থেকে শুরু করে পাকিস্তান আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন, ছয় দফা, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, মুক্তিযুদ্ধ এবং ফারাক্কা লংমার্চ–সবগুলোতেই তিনি নেতৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। রাজনৈতিক কার্যক্রমের দরুন তিনি তাসাউফ থেকেও বিচ্যুত হননি; আসাম, সিরাজগঞ্জ ও টাঙ্গাইলে তাঁর অনেক মুরিদ ছিল। পীর নাসিরউদ্দিন বোগদাদির মাধ্যমে তিনি চিশতিয়া ও নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া তরিকার খেলাফত লাভ করেন। বাংলার সুফিদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এমন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব দ্বিতীয়জন পাওয়া যায় না।

রুহানিয়্যত

কুরআনে রুহ পরিভাষাটি ১৬ স্থানে ব্যবহার করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১০ বার এসেছে হজরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামের নাম হিসেবে। জিবরাঈল প্রসঙ্গ ব্যতীত রুহ পরিভাষাটি যত জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে সকল ক্ষেত্রেই প্রায় একই অর্থে এসেছে। আমরা যদি হজরত আদম আলাইহিস সালামের সৃষ্টি প্রসঙ্গে কুরআনের বর্ণনা দেখি:

"অতঃপর আমি তাকে সুঠাম করবো এবং ত৯ার মধ্যে রুহ দিবো, তখন তোমরা তাকে সিজদা করবে"। (১৫:২৯, ৩৮:৭২)

এখানে দুইটি পয়েন্ট পাওয়া যায়: ১. শারীরিক আকৃতি সৃষ্টি করার পর আল্লাহ তায়ালা তাতে রুহ দিলেন এবং রুহ দেয়ার পর তা 'আদম' হিসেবে পরিপূর্ণ হলো, পরিপূর্ণ হবার পরেই ফেরেশতাদের বলা হলো সেজদা করতে, অর্থাৎ রুহের মাধ্যমে আদমকে সেজদা গ্রহণের উপযুক্ত করে তোলা হলো। ২. ইবলিস কেবল 'মাটির' উপাদান মনে করে আদমকে সেজদা করতে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করলো। কিন্তু মাটির আদমে আল্লাহ যখন রুহ দিলেন তখন আর তা স্রেফ 'মাটির আদম' থাকলো না, রুহানিয়্যতসম্পন্ন আল্লাহর খলিফা হয়ে উঠলো। রুহ দেয়ার পূর্বে শারীরিক আকৃতি স্রেফ একটি আকৃতি, পুতুল, খামির; রুহ সংযুক্ত করার পর তা জলজ্যান্ত, মর্যাদাবান, বিবেকবান। সূরা বনি ইসরাইলে আল্লাহ তায়ালা রুহকে 'আমার নির্দেশ' বলে চিহ্নিত করেছেন। আরবি 'আমর' শব্দটি বিভিন্ন অর্থেই ব্যবহৃত হয়। অনেক মুফাসসির এখানে রুহ বলতে 'বিবেকবোধ' বোঝানোর কথা বলেন। বলা যায়, আল্লাহ তায়ালার যে ইনসাফ ধারণা তার সাথে মানুষের বিবেকবোধের একটি সম্পর্ক রয়েছে। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা রুহ শব্দ দ্বারা এই সম্পর্ক সংযুক্ত করতে চেয়েছেন। বিবেক এমন জিনিস যা দ্বারা মানুষ ভালো এবং মন্দের পার্থক্য করতে পারে। আমরা যখন বলি সত্যিকার অর্থে মানুষ তখন বিবেকবোধসম্পন্ন মানুষের কথাই বলি। যখন মানুষ একটি খারাপ কাজ করে তখন আমরা বলি, তোমার কি বিবেক নাই? অর্থাৎ যখন মানুষ খারাপ কাজ করে তখন আমরা ধরেই নেই যে, এই লোকটির বিবেক বলতে কিছু নেই। মানুষ যখন বেইনসাফি, জুলুম করে তখন মানুষের রুহ থাকে না, রুহানিয়্যত থাকে না। রুহ পরিভাষাটির দুইটি অর্থ আমরা দেখছি: ১. জীবনীশক্তি; ২. বিবেকবোধ। জীবনীশক্তি ও বিবেকবোধ এই দুইটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। বিবেকবোধ না থাকলে সে যতই সুস্থ ও সবল মানুষ হোক না কেন, 'জীবনীশক্তি' আছে তা বলা যাবে না। কেননা, ফেরেশতার সেজদা গ্রহণের উপযুক্ত হবার জন্য, আল্লাহর খলিফা হিসেবে মর্যাদাবান হবার জন্য যে 'রুহানিয়্যত' (বিবেকবোধ) প্রয়োজন তা যদি না থাকে তাহলে মানুষ রুহ ব্যতীত খামিরে পরিণত হয় যার কোনো মর্যাদাবোধ থাকে না। জুলুমের বিরুদ্ধে থাকা, ইনসাফের জন্য লড়াই করা, সত্যের পক্ষে সোচ্চার থাকা রুহানিয়্যতের অংশ। আল্লাহ তায়ালা রুহ দিয়ে যেভাবে মাটির খামির থেকে আদমকে মর্যাদাবান করে ফেরেশতার সেজদা গ্রহণের জন্য উপযুক্ত করেছিলেন, তেমনি ইনসাফের পক্ষে থেকে মানুষকে বিবেকবান হিসেবে আল্লাহর খলিফা হিসেবে উপযুক্ত হতে হয়। যখন মানুষ ইনসাফের পক্ষে থেকে বিবেকবান হিসেবে আল্লাহর খলিফা হবার উপযুক্ত হয় তখনই সে রুহানিয়্যতসম্পন্ন মানুষ।

---

১৫. প্রাগুক্ত, ১৪৭-৫০

১৬. *মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী*: সৈয়দ আবুল মকসুদ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৪, ১৪-২০

জুলাই অভ্যুত্থানের রুহানিয়্যত

জুলাই অভ্যুত্থানে মানুষের অংশগ্রহণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, জুলুম হটিয়ে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা। সুফিদের যে সংগ্রাম আমরা উল্লেখ করেছি সেখানেও এই উদ্দেশ্যের প্রতিফলন ঘটেছে। ইনসাফ এবং রুহানিয়্যতের এই পারস্পরিক সংযোগ হাজার বছর আগের শাহ সুলতান বলখী এবং জুলাই অভ্যুত্থানের নেতৃত্বের মাঝে সম্পর্কের পাটাতন হিসেবে কাজ করে।

১৬ জুলাই আবু সাঈদ শহীদ হবার পরই মানুষের প্রস্তুতি শুরু হয়েছিলো রাস্তায় নামার। সন্তানদের, নাগরিকদের হত্যার বিচারের জন্য মানুষ জীবনের মায়া ত্যাগ করে সংগ্রামের পথ বেছে নেয়। হত্যার বিচারের উসিলায় বিপ্লবের ডাকের সাথে হজরত শাহজালালের সংগ্রামের সাথে মিল রয়েছে। বোরহানউদ্দিনের ছেলেকে যখন গরু জবাইয়ের ছুতোয় গৌড়গোবিন্দ হত্যা করে তখন এই হত্যা যেভাবে বিপ্লবের প্রেক্ষাপট তৈরি করে, তেমনি শহীদ আবু সাঈদ এবং অন্যান্য আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতার হত্যার মাধ্যমে জুলাই অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপট তৈরি হয়। হত্যার বিচার, অর্থাৎ ইনসাফের জন্যই ছিল সংগ্রাম।

সুফিদের যত সংগ্রাম আমরা দেখি, সবগুলোই সেটেলমেন্ট তথা স্থানীয় ক্ষমতাসীন রাজাদের বিরুদ্ধে। ফলত, লোকবল, যুদ্ধসামগ্রী সবদিক দিয়েই যোজন যোজন এগিয়ে ছিল ক্ষমতাসীন জালেমরা। তথাপি এমন কোনো ঘটনা আমরা পাইনি যেখানে কোনো সুফি ক্ষমতাসীনদের লোকবল বা যুদ্ধসামগ্রী দেখে পিছু হটেছেন। জুলাই অভ্যুত্থানেও আইন শৃঙ্খলা বাহিনী, ক্ষমতাসীন সন্ত্রাসীদের অস্ত্রের মুখে পিছু হটেনি ছাত্র-জনতা। আমরা একটি ভিডিও দেখেছি, যেখানে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে একজন পুলিশ সদস্য ভিডিও দেখিয়ে বলছে, 'স্যার, গুলি করি একটা, মরে একটা, বাকিডি যায় না'। রুহানিয়্যতের চূড়ান্ত পর্যায়ে না গেলে ইনসাফের জন্য গুলির মুখে দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করা অসম্ভব। ছাত্র-জনতা পুরোপুরি রুহানিয়্যতের মধ্যেই ডুবে ছিল জুলাইতে। উল্লেখিত সুফিদের মধ্যে অনেকে যেমন সংগ্রাম করতে গিয়ে শহীদ হয়েছেন, তেমনি অভ্যুত্থানে জালেমের হাতে শহীদ হয়েছে ছাত্র-জনতা। জালেমের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর রুহানি স্পিরিট সুফিদের মতো সমান্তরালভাবে অভ্যুত্থানের ছাত্র-জনতার মাঝেও বিরাজ করেছিলো।

অভ্যুত্থানে আমরা দেখেছি, আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়ে দোয়া করা হয়েছে। ৪ ও ৫ আগস্ট অনেক মানুষ রোজা রেখেছিলেন, তাহাজ্জুদ আদায় করেছিলেন। অভ্যুত্থানকারীদের ভরসা ছিল যে, তাঁরা যেহেতু ইনসাফের পক্ষে সংগ্রাম করছে, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তাঁদেরকে সাহায্য করবেন। হজরত মুসার বিরুদ্ধে থাকা জালেম ফেরাউন; হজরত ইবরাহীমের বিরুদ্ধে থাকা নমরুদকে যেভাবে আল্লাহ তায়ালা ধ্বংস করেছিলেন, জালেম হাসিনারও পতন ঘটাবেন তিনি– এমন কামনা অনেকেরই ছিল। অভ্যুত্থানকালে তিনটা জুমার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়েছিলো, ১৯, ২৬ জুলাই ও ১ আগস্ট। এই জুমাগুলোতে বহু মসজিদের খতিব সাহেব ইসলামের দৃষ্টিতে জুলুম, জালেম নিয়ে খুতবা দিয়েছেন, অনেকে ফেরাউনের পতন নিয়ে উঁচু গলায় ওয়াজ করেছেন, অনেকে মক্কার আবু জাহেলের পরিণতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। যত মসজিদে এমন আলোচনা হয়েছে, সেখানে যত শ্রোতা ছিল সবাইকেই উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে জালেমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে, সবাইকেই আল্লাহর ভরসার ব্যাপারে নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছিলো, ইনসাফের পক্ষে সংগ্রাম করা যে একজন মুসলমানের কর্তব্য সে ব্যাপারে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছিলো। যখন মানুষ আল্লাহর উপর ভরসা করে, জালেমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করলে আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার নিশ্চয়তা নিয়ে রাস্তায় নেমেছিলো তখন আর বলার অপেক্ষা রাখে না, যতক্ষণ সে জালেমের বিরুদ্ধে ইনসাফের জন্য সংগ্রামে ছিল ততক্ষণ রুহানিয়্যতের মধ্যেই ছিল। সুফিরা যেভাবে আল্লাহর উপর ভরসা করে জালেমের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছেন, দলবল, অস্ত্রশস্ত্রের পরোয়া করেননি, তদ্রূপ অভ্যুত্থানের ছাত্র-জনতাও পরোয়া না করেই নেমেছিলেন রাস্তায়। জালেমের পতনের পর গণভবন, সংসদ ভবনের মাঠ এবং খোলা রাস্তায় মানুষকে আনন্দ উল্লাসের সহিত শুকরিয়া নামাজ আদায় করতে দেখা গেছে। আল্লাহর উপর ভরসা করে যে জালেমের পতনের জন্য বান্দা রাস্তায় নেমেছিলো সে জালেমের পতনের পর বান্দা আল্লাহর সাহায্যের কথা ভোলেনি। মানুষ হিসেবে আমাদের প্রচেষ্টা এবং আল্লাহর সাহায্যের মিশেলেই শতাব্দীর অন্যতম নৃশংস জালেমের পতন ঘটানো সম্ভব হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, অভ্যুত্থানকারী ছাত্র জনতার মননে এই বিষয়টি ভালোভাবেই গাঁথা ছিল। জালেমের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর এই ঘটনা বাংলার মুসলমানদের জন্য নতুন নয়, বরং তাঁদের নিকট যেসব সুফিরা ইসলামের দাওয়াত নিয়ে এসেছিলেন তাঁরাও একই কায়দায় জালেমের বিরুদ্ধে আল্লাহর ভরসায় সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন। উভয়ের মধ্যেই ছিল রুহানিয়্যত; রুহানিয়্যত হজরত শাহজালাল এবং অভ্যুত্থানের ছাত্র-জনতার মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে।

মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার যে মর্যাদা তা যদি না থাকে তাহলে মানুষ তার বেঁচে থাকা অর্থহীন মনে করে। মানুষের সাথে অন্যান্য সৃষ্টির পার্থক্য হলো, মানুষের মর্যাদাবোধ আছে এবং বিবেকবোধ আছে। মূলত বিবেকবোধের উপরই মর্যাদা নির্ভরশীল। জুলাই অভ্যুত্থানে মানুষ বিবেকের তাড়নায় জালেমের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যুক্ত হয়েছিলেন। ইনসাফ ছাড়া অভ্যুত্থানের ছাত্র-জনতার– মোটাদাগে– দ্বিতীয় কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। বিবেকবোধ থাকা মানে রুহানিয়্যতসম্পন্ন মানুষ– যার মাধ্যমেই মানুষ ইবলিসের চেয়ে পৃথক ও শ্রেষ্ঠ। এই রুহানিয়্যতই ছিল জুলাই অভ্যুত্থানের ছাত্র-জনতার মূল শক্তি। আমরা একে 'নৈতিক শক্তি' হিসেবেও চিহ্নিত করে থাকি। রুহানিয়্যতের মধ্যে না থাকলে ইনসাফের জন্য গুলির সামনে বুক পেতে দেয়া সম্ভব ছিল না, পরিবারের মায়া ত্যাগ করে রাস্তায় নামা সম্ভব ছিল না। বিবেকবোধ– যাকে আমরা রুহানিয়্যত বলছি, তা যখন ব্যক্তির মধ্যে সঞ্চারিত হয় তখন সে কোনো পেশিশক্তির ধার ধারে না, কোনো মিথ্যাকে সহ্য করতে পারে না, কোনো জালেমকে মেনে নিতে পারে না। রুহানিয়্যত ছিল বলেই জুলাই-অভ্যুত্থান সফল হয়েছিল, চোখের সামনে হাজারো লাশ পড়েছে কিন্তু ছাত্র-জনতা একবারের জন্যও পেছনে তাকানোর চিন্তা করেনি, একবারের জন্যও মনে হয়নি এইবার ক্ষান্ত দেয়া দরকার, মুহূর্তের জন্য মনে হয়নি সংগ্রাম এখানেই শেষ। রুহানিয়্যত ছিল জুলাই-অভ্যুত্থানের মূল শক্তি আর জুলাই অভ্যুত্থানের রুহানিয়্যত ছিল ইনসাফ।

রুহানিয়্যতের এই রাজনীতি বাংলাদেশে নতুন নয়, ব্রিটিশ আমলেই মাওলানা আজাদ সোবহানির মাধ্যমে এর তাত্ত্বিক সূত্রপাত ঘটে। আজাদ সোবহানির রব্বানিয়্যত তত্ত্ব আর আমাদের রুহানিয়্যত তত্ত্বের গোড়া অভিন্ন। আজাদ সোবহানির কাছ থেকে সরাসরি প্রাপ্ত এই তত্ত্বের রাজনৈতিক বাস্তবায়নের চেষ্টা করেছেন মাওলানা ভাসানী। এই বিষয়ে ভাসানীর বক্তব্য উল্লেখযোগ্য: "হুকমতে রাব্বানিয়ার মূল কথা আল্লাহর দোস্ত আমাদের দোস্ত, আল্লাহর দুশমন আমাদের দুশমন। এই সমিতি সমাজতন্ত্রবাদীদের মত কেবল লা ইলাহা-ই কায়েম করিবে না, সেখানে ইল্লাল্লাহর বীজও বপন করিবে। তাহাদের কোনো কাজে আত্মতুষ্টি অর্থাৎ নফসানিয়াত যেমন থাকিবে না ঠিক তেমনি অহেতুক বৈরাগ্য অর্থাৎ রাহবানিয়াতও থাকিবে না। এই সমিতি যেমন হক্কুল্লাহ আদায় করিবে ঠিক তেমনি হক্কুল এবাদতও করিয়া যাইবে। স্রষ্টাকে ভালবাসিয়া, সৃষ্টির কল্যাণ সাধন করিয়া তাহারা রবের ঐশী পালনবাদকে পার্থিব ভঙ্গিমা দান করিবে। তাই এই সমিতি মানুষের যেমন বৈষয়িক উন্নতি ঘটাইবে সঙ্গে সঙ্গে তেমনি আত্মিক শক্তির বিকাশও ঘটাইবে।... সকল সমস্যার সমাধান হইবে মানবজাতি যদি রবুবিয়তে অর্থাৎ স্রষ্টার পালনবাদের আদর্শে হুকমত কায়েম করিতে পারে। শিক্ষাদীক্ষা, খাওয়াপরা ইত্যাদির প্রশ্নে স্রষ্টার নিকট যেমন হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ইত্যাদি পরিচয়ের কোনো বালাই নাই– মানুষের দৈহিক ও আত্মিক চাহিদার ক্ষেত্রে যেমন ভেদাভেদ নাই ঠিক তেমনি হুকমতে রাব্বানিয়ায় সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে সকল নাগরিককে সমান সুযোগ ও অধিকার দেওয়া হইবে। আজ আর কোনো সন্দেহ নাই– একমাত্র রবুবিয়তের আদর্শই মানুষে মানুষে শাসন, শোষণ ও হানাহানি বন্ধ করিয়া মানবজাতিকে সুখী করিতে পারে। কেউ কেউ প্রশ্ন করিতে পারেন হুকমতে রাব্বানিয়া কিভাবে অমুসলমানদেরকে আপন করিয়া লইবে? যাহারা রবুবিয়তের মর্ম বুঝেন না তাহাদের এই প্রশ্ন করা খুবই স্বাভাবিক। রবুবিয়ত কোন ধর্মের কথা নহে। উহা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একটি স্বতঃসিদ্ধ বিধান। তাই হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খৃষ্টান সকল মানুষের জন্য হুকমতে রাব্বানিয়া অর্থাৎ যে দেশে রবুবিয়তের আদর্শ রাষ্ট্রীয় ভিত্তিতে কায়েম হইয়াছে, কল্যাণকর বৈ কিছু নয়। মুসলমানদের জন্য যিনি রব বা পালনকর্তা, বিবর্তনকারী প্রভু, হিন্দুদের জন্য তিনি একই বিধানে আলো, হাওয়া, ফল, পানি, বস্ত্র, খাদ্য সবই যোগাইতেছেন। একমাত্র রবুবিয়তের আদর্শই মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে পারে।"[১৭] রুহানিয়্যতের যে ধারণা আমরা উল্লেখ করেছি তাতে ভাসানীর রবুবিয়তের সঙ্গে উল্লেখযোগ্য তফাত নেই। মূল উদ্দেশ্য, ইনসাফভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। আল্লাহর খলিফা হিসেবে সমাজের সকল স্তরের মানুষের মাঝে ইনসাফ ও সকল সৃষ্টির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। জুলাই অভ্যুত্থানে যে লক্ষ্যে দেড় হাজার মানুষ প্রাণ দিয়েছেন, সে লক্ষ্যের আনুষ্ঠানিক রাজনীতি মাওলানা ভাসানী বাস্তবায়নের চেষ্টা করেছেন। রুহানিয়্যতের রাজনৈতিক তত্ত্ব নিয়ে পাকিস্তান হাসিলের পর মাওলানা আবুল হাশিমও কাজ করেছেন। তিনি বলেছেন: "রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি নরনারী নিজের ব্যক্তিগত ব্যবহারিক জীবনে ও সংঘবদ্ধভাবে রাষ্ট্রকে উহার এই মহান কর্তব্য পালনে নিষ্ঠা ও সততার সহিত সাহায্য করিবেন। কারণ, প্রত্যেক মানুষই আল্লাহর রবুবিয়াতের খলিফা–শুধু রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রপতি নহেন। ইসলামী রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি ও সাধারণ নাগরিকের মধ্যে বিশেষ কোন বৈষম্য অথবা মর্যাদার প্রাচীর বিরাজ করে না। কেননা, এ ব্যবস্থায় কেহ কাহারও দাসও নহে, প্রভুও নহে–পরস্পর ভাই ভাই, এক আল্লাহর দাস এবং একমাত্র তাহারই অধীন। তাহাদের উভয়েরই দায়িত্ব এক আল্লাহর রবুবিয়াতের প্রতিনিধিত্ব করা এবং দ্বীনের নির্দেশ অনুযায়ী নিজেদের ব্যষ্টি ও সমষ্টি-জীবন পরিচালিত করা। তাহারা প্রত্যেকেই সমাজের এক একটি বিশেষ কর্তব্য পালনের দায়িত্বে আসীন। খিলাফতে যখন খলীফা হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য একজন নাগরিক পর্যন্ত সকলেই জন-কল্যাণের জন্য দায়ী, তখন এই গুরুদায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে প্রতিটি নাগরিকের

১৭. মকসুদ, প্রাগুক্ত, ৪৮৪

জন্য বাক স্বাধীনতা থাকা একান্ত অপরিহার্য। বাকস্বাধীনতা না থাকিলে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিবাদ কেমন করিয়া হইবে?"[১৮] রুহানিয়্যতের রাজনীতিতে যে দায়িত্বের কথা আবুল হাশিম বলেছেন, তার বাস্তবায়ন আমরা জুলাই অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী ছাত্র-জনতার ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি। ৫ আগস্ট স্বৈরাচারের পতনের পর, হিন্দু সম্প্রদায়ের উপাসনালয় মন্দিরগুলোতে হামলার সম্ভাবনা তৈরি হয়, তখন অভ্যুত্থানে অংশ নেয়া ছাত্র-জনতা রাত জেগে সম্মিলিতভাবে মন্দিরের নিরাপত্তা নিশ্চিতের গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন। একটি রক্তাক্ত অভ্যুত্থান প্রাথমিক সফলতা অর্জনের সাথে সাথেই এমন স্পর্শকাতর বিষয়ে নিজে থেকে দায়িত্ব নেয়া এবং তা যথাযথভাবে পালন করতে পারাটা চাট্টিখানি কথা নয়। কেবল মন্দিরই নয়, পাশাপাশি ৫ আগস্ট থেকে ৮ আগস্ট সরকার গঠনের আগ পর্যন্ত, ট্রাফিকের দায়িত্ব নেয়া, চোর ও ডাকাতের বিরুদ্ধে এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিতের দায়িত্ব নেয়া, বাজার ব্যবস্থা মনিটরিং ইত্যাদি নানাভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেছে। ব্যক্তি ও সমষ্টি যখন রুহানিয়্যতের রাজনীতিতে সক্রিয় থাকে তখনই তাঁর পক্ষে এমন একটি অভ্যুত্থান সফল করে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করা সম্ভব। কিন্তু প্রশ্ন হলো, অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী ছাত্র-জনতার এই ভূমিকার ধারাবাহিকতা কেন নস্যাৎ হয়ে গেলো? অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে দেখা গিয়েছে, ছাত্র-জনতা রুহানিয়্যতের রাজনীতি থেকে যত দূরে সরে গিয়েছে অভ্যুত্থানের উদ্দেশ্যও ততই মরীচিকাতে পরিণত হয়েছে। জুলাই অভ্যুত্থানের উদ্দেশ্য এবং রুহানিয়্যতের রাজনীতি প্রায় অভিন্ন।

রবুবিয়তের ব্যাখ্যায় আবুল হাশিমের এই বক্তব্যে বাকস্বাধীনতার কথাও এসেছে, যার অভাববোধ জুলাই অভ্যুত্থানের অন্যতম একটি কারণ। আধুনিক রাষ্ট্রের কাঠামো অনুযায়ী জুলুমের সূচনা হয় বাকস্বাধীনতা হরণের মাধ্যমে। ফলত, রুহানিয়্যতের মধ্যে বাকস্বাধীনতার নিশ্চয়তা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পাকিস্তান আমলেই আবুল হাশিম এই গুরুত্ব অনুধাবন করে বাকস্বাধীনতাকে রবুবিয়তের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। মাওলানা ভাসানী এবং আবুল হাশিম রবুবিয়ত তত্ত্বের প্রচার করেছেন পাকিস্তান আমলে; মাওলানা ভাসানী সাংগঠনিকভাবে এবং আবুল হাশিম লেখালেখির মাধ্যমে প্রচারে নিয়োজিত ছিলেন। ভাসানী ও হাশিমের মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি রাজনৈতিকভাবে রবুবিয়ত বা রুহানিয়্যতের তত্ত্ব প্রচার সত্ত্বেও কেন তার ডালপালা মেলেনি, বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি এ প্রশ্ন জরুরী।

মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। কিন্তু সংবিধানের ৪টি মূলনীতি: জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা'র বাস্তবায়নের দোহাই দিয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে জন্মলগ্ন থেকেই এমন এক 'সেক্যুলার' মুখোশ পরিধান করানো হয়েছে যেখানে রাষ্ট্রের চরিত্র ও সংস্কৃতিকে ধর্মের মুখোমুখি দাঁড় করানো হয়েছে। নামমাত্র সেক্যুলারাইজেশনের মাধ্যমে রাষ্ট্রকে ধর্মের শত্রু হিসেবে দাঁড় করিয়ে সিংহভাগ জনগণের সাথে রাষ্ট্রীয় চরিত্র ও সংস্কৃতির দেয়াল তৈরি করা হয়েছে। যে কারণে বাংলাদেশ রাষ্ট্রে ইসলামের ইনসাফ ধারণার মেলবন্ধন ঘটিয়ে রাজনীতি করা সম্ভব হয়নি। বাংলার সুফিদের যে সংগ্রামী ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় মাওলানা ভাসানী ও আবুল হাশিম রবুবিয়ত তত্ত্বের প্রচার করেছেন তার ন্যূনতম বাস্তবায়ন বাংলাদেশে সম্ভব হয়নি। জুলাই অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের এই 'সেক্যুলার' মুখোশ খুলে গিয়েছে, যা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ক্ষতি ছাড়া উপকার করেনি। জুলাই অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আবারো সুযোগ এসেছে, রবুবিয়ত, রুহানিয়্যতের রাজনীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রে ইনসাফ কায়েম করার। এতে করে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং রাষ্ট্রীর চরিত্রের মধ্যে দূরত্ব কমবে, ফলত রাষ্ট্রের প্রতি জনগণের আস্থা বাড়বে। জুলাই অভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশে রুহানিয়্যতের রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করতে পারাটা এখন জরুরী চ্যালেঞ্জ আকারে হাজির হয়েছে। যে রাজনীতিতে ইতিহাস-ঐতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতির কোনো পর্বকেই অস্বীকার না করে যথাযথ মূল্যায়নের সহিত নাগরিকগণ রাষ্ট্রকে ঔন করবেন এবং উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ করবেন।

উপসংহার: ইনসাফ প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে নেতৃত্ব দেয়া সুফিদের সংগ্রামী ঐতিহ্য রয়েছে। এই ঐতিহ্যকে জুলাই অভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক পরম্পরা হিসেবে বিবেচনা করা যায়, অন্তত উদ্দেশ্যের জায়গা থেকে। জুলাই অভ্যুত্থানের রুহানিয়্যত ছিল ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা ও নিজ নিজ জায়গায় দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করা। অভ্যুত্থানকালে ছাত্র-জনতা এই রুহানিয়্যতের মধ্যে ছিল বিধায় অভ্যুত্থান সফল হয়েছে। পরবর্তীতে রুহানিয়্যতের রাজনীতি থেকে বিচ্যুতি অভ্যুত্থানের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বাঁধা হিসেবে কাজ করেছে। যদি জুলাই অভ্যুত্থানের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে হয় তাহলে অবশ্যই রুহানিয়্যতের রাজনীতিতে ফিরে আসতে হবে।

---

১৮. রব্বানী দৃষ্টিতে: আবুল হাশিম, আবুজর গিফারী সোসাইটি, ঢাকা, ৯৫-৬

গ্রন্থপঞ্জিঃ

১. *বাংলাদেশে ইসলাম*: আবদুল মান্নান তালিব, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৯৪

২. *রাজশাহীতে ইসলাম*: ডঃ এ কে এম ইয়াকুব আলী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৯২

৩. *মুহম্মদ এনামুল হক রচনাবলী* (চতুর্থ খণ্ড): মনসুর মুসা সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৫ (*A History of Sufi-Ism in Bengal*)

৪. *মুহম্মদ এনামুল হক রচনাবলী* (প্রথম খণ্ড) : মনসুর মুসা সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯১ (*বঙ্গে স্বূফী-প্রভাব*)

৫. *চট্টগ্রামের সুফি সাধক ও দরগাহ*: ড. মুহম্মদ শেহাবুল হুদা, শাহাব উদ্দিন নীপু অনুদিত, অন্বেষা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৯

৬. *রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা*: ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০০৯

৭. *মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী*: সৈয়দ আবুল মকসুদ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৪

৮. হযরত শাহ্ মখদুম রূপোশ (রহ.) এর জীবনেতিহাস: মুহম্মদ আবু তালিব সম্পাদিত, পাকিস্তান বুক করপোরেশন, ঢাকা, ১৯৬৯

৯. বাংলাদেশের সত্তার অন্বেষা: আকবর আলি খান, আমিনুল ইসলাম ভুইয়া অনুদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৪

১০. *বাংলার ইতিহাস (রিয়াজ-উস সালাতীনের বঙ্গানুবাদ)* : আকবরউদ্দীন অনুদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৪

১১. রব্বানী দৃষ্টিতে: আবুল হাশিম, আবুজর গিফারী সোসাইটি, ঢাকা

১২. The Rehla of Ibn Battuta: Mahdi Husain, Oriental Institute, Baroda, 1976

১৩. *Social and Cultural History of Bengal* (Vol. 1): Muhammad Abdur Rahim, Dhaka, 1959

১৪. *The Rise of Islam and Bengal Frontier*, 1204-1760: Richard M. Eaton, University of California Press, London, 1993, 73-80